র বী ন্দ্র না থ ঠা কু র

বাউলের গান

সঙ্গীত সংগ্রহ। বাউলের গাথা

এমন কোন কোন কবির কথা শুনা গিয়াছে, যাঁহারা জীবনের প্রারম্ভ ভাগে পরের অনুকরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন-অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, অনেক ভাল ভাল কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি শুনিলে মনে হয় যেন তাহা কোন একটি বাঁধা রাগিণীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নূতন ঠেকিতেছে না। অবশেষে এইরূপ লিখিতে লিখিতে, চারি দিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে, সহসা নিজের যেখানে মর্ম্মস্থান, সেইখানটি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আর তাঁহার বিনাশ নাই। এবার তিনি যে গান গাহিলেন তাহা শুনিয়াই আমরা কহিলাম, বাঃ, এ কি শুনিলাম ! এ কে গাহিল ! এ কি রাগিণী ! এত দিন তিনি পরের বাঁশি ধার করিয়া নিজের গান গাহিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণের সকল সুর কুলাইত না। তিনি ভাবিয়া পাইতেন না -- যাহা বাজাইতে চাহি তাহা বাজে না কেন ! সেটা যে বাঁশির দোষ ! ব্যাকুল হইয়া চারি দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা দেখিলেন তাঁহার প্রাণের মধ্যেই একটা বাদ্য আছে। বাজাইতে গিয়া উল্লাসে নাচিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "এ কি হইল। আমার গান পরের গানের মত শোনায় না কেন ? এত দিন পরে আমার প্রাণের সকল সুরগুলি বাজিয়া উঠিল কি করিয়া ? আমি যে কথা বলিব মনে করি সেই কথাই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে ! " যে ব্যক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজে কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই। সে কথা কহিয়া কি সুখীই হয় ! তাহার এক একটি কথা তাহার এক একটি জীবিত সন্তান। ঘরের কাছে একটি উদাহরণ আছে। বঙ্কিমবাবু যখন দুর্গেশনন্দিনী লেখেন তখন তিনি যথার্থ নিজেকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। লেখা ভাল হইয়াছে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে সর্ব্বত্র তিনি তাঁহার নিজের সুর ভাল করিয়া লাগাইতে পারেন নাই। কেহ যদি প্রমাণ করে, যে, কোন একটি ক্ষমতাশালী লেখক অন্য একটি উপন্যাস অনুবাদ বা রূপান্তরিত করিয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন, তবে তাহা শুনিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু কেহ যদি বলে, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর বা বঙ্কিমবাবুর শেষ-বেলাকার লেখাগুলি অনুকরণ, তবে সে কথা আমরা কানেই আনি না।

ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যাহা খাটে, জাতি সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। চারি দিক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গালী জাতির যথার্থ ভাবটি যে কি তাহা আমরা সকলে ঠিক ধরিতে পারি নাই-বাঙ্গালী জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে তাহা আমরা ভাল জানি না। এই নিমিত্ত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। পড়িয়া মনে হয় না, বাঙ্গালীতেই ইহা লিখিয়াছে, বাঙ্গালাতেই ইহা লেখা সম্ভব এবং ইহা অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহারা বাঙ্গালীর হৃদয়-জাত একটি নূতন জিনিষ লাভ করিতে পারিবে। ভাল হউক মন্দ হউক, আজকাল যে সকল লেখা বাহির হইয়া থাকে তাহা পড়িয়া মনে হয়, যেন এমন লেখা ইংরাজিতে বা অন্যান্য ভাষায় সচরাচর লিখিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ, এখনো আমরা বাঙ্গালীর ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই ! সংস্কৃতবাগীশেরা বলিবেন, ঠিক কথা বলিয়াছ, আজকালকার লেখায় সমাস দেখিতে পাই না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত কথার আদর নাই, এ কি বাঙ্গালা ! আমরা তাঁহাদের বলি, তোমাদের ভাষাও বাঙ্গালা নহে, আর ইংরাজিওয়ালাদের ভাষাও বাঙ্গালা নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে। ছেলে কোলে করিয়া সহরময় ছেলে খুঁজিয়া বেড়ান যেমন, তোমাদের ব্যবহারও তেমনি দেখিতেছি। তোমরা বাঙ্গালা বাঙ্গালা করিয়া সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, সংস্কৃত ইংরাজি সমস্ত ওলট্-পালট্ করিতেছ, কেবল একবার হৃদয়টার মধ্যে অনুসন্ধান

করিয়া দেখ নাই। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে একটি গান আছে --
আমি কে তাই আমি জানলেম না,
আমি আমি করি কিন্তু, আমি আমার ঠিক হইল না।
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি,
কোথা হইতে এলাম আমি তারে কই গণি !
আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা আমরা যদি আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙ্গালী যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।
যাঁহাদের প্রাণ বিদেশী হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কথায় কথায় বলেন-- ভাব সর্ব্বত্রই সমান। জাতিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি কিছুই নাই ! কথাটা শুনিতে বেশ উদার, প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের মনে একটি সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয়, যাহার নিজের কিছু নাই, সে পরের স্বত্ব লোপ করিতে চায়। উপরে যে মতটি প্রকাশিত হইল, তাহা চৌর্য্যবৃত্তির একটি সুশ্রাব্য ছুতা বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা ইংরাজি হইতে দুই হাতে লুট করিতে থাকেন, বাঙ্গালাটাকে এমন করিয়া তোলেন যাহাতে তাহাকে আর ঘরের লোক বলিয়া মনে হয় না, তাহারাই বলেন ভাষাবিশেষের নিজস্ব কিছুই নাই, তাঁহারাই অম্লান বদনে পরের সোনা কানে দিয়া বেড়ান। আমারই যে নিজের সোনা আছে এমন নয়, কিন্তু তাই বলিয়া একটা মতের দোহাই দিয়া সোনাটাকে নিজের বলিয়া জাঁক করিয়া বেড়াই না। ভিক্ষা করিয়া থাকি, তাতেই মনে মনে ধিক্কার জন্মে, কিন্তু অমন করিলে যে স্পষ্ট চুরি করা হয়।
সাম্য এবং বৈষম্য, দুটাকেই হিসাবের মধ্যে আনা চাই। বৈষম্য না থাকিলে জগৎ টিকিতেই পারে না। সব মানুষ সমান বটে, অথচ সব মানুষ আলাদা। দুটো মানুষ ঠিক এক ছাঁচের, এক ভাবের পাওয়া অসমম্ভব, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তেমনি দুইটি স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে মনুষ্যস্বভাবের সাম্যও আছে, বৈষম্যও আছে। আছে বলিয়াই রক্ষা, তাই সাহিত্যে আদান-প্রদান বাণিজ্য-ব্যবসায় চলে। উত্তাপ যদি সর্ব্বত্র একাকার হইয়া যায়, তাহা হইলে হাওয়া খেলায় না, নদী বহে না প্রাণ টেকে না। একাকার হইয়া যাওয়ার অর্থই পঞ্চত্ব পাওয়া। অতএব আমাদের সাহিত্য যদি বাঁচিতে চায়, তবে ভাল করিয়া বাঙ্গালা হইতে শিখুক।
ভাবের ভাষার অনুবাদ চলে না। ছাঁচে ঢালিয়া শুষ্ক জ্ঞানের ভাষায় প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করা যায়। কিন্তু ভাবের ভাষা হৃদয়ের স্তন্য পান করিয়া, হৃদয়ের সুখদুঃখের দোলায় দুলিয়া মানুষ হইতে থাকে। সুতরাং তাহার জীবন আছে। ছাঁচে ঢালিয়া তাহার একটা নির্জ্জীব প্রতিমা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা চলিয়া ফিরিয়া বেড়হেতে পারে না, ও হৃদয়ের মধ্যে পাষাণভারের মত চাপিয়া পড়িয়া থাকে। force of gravitation-কে ভারাকর্ষণ শক্তি বলিলে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু ইংরাজিতে liberty ওfreedom শব্দে যে ভাবটি মনে আসে, বাঙ্গালায় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য শব্দে ঠিক সে ভাবটি আসে না -- কোথায় একটুখানি তফাৎ পড়ে। ইংরাজীতে যেখানে বলে "free as mountain air", আমরা যদি সেইখানে বলি "পর্ব্বতের বাতাসের মত স্বাধীন", তাহা হইলে কি কথাটা প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে ? আমরা আজকাল ইংরাজির ভাবের ভাষাকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতেছি- মনে করিতেছি ইংরাজি ভাবটি বুঝি ঠিক বজায় রাখিলাম -- কিন্তু তাহার প্রমাণ কি ? আমাদের সাহিত্যে এখন ইংরাজি-ওয়ালারা যাহা লেখেন, ইংরাজি-ওয়ালারাই তাহা পড়েন, ভাবগুলিকে মনে মনে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া লন -- তাঁহাদের যাহা কিছু ভাল লাগে, ইংরাজির সহিত মিলিতেছে মনে করিয় ভাল লাগে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইংরাজি বুঝে না সে ব্যক্তিকে ঐ লেখা পড়িতে দাও, কথাগুলি তাহার প্রাণের মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে পারে তবেই বুঝিলাম যে, হাঁ, ইংরাজি ভাবটা বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নহিলে অনুবাদ করিলেই যে ইংরাজি বাংলা হইয়া যাইবে, এমন কোন কথা নাই।
অতএব, বাঙ্গালা ভাব ও ভাবের ভাষা যতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই যে আমাদের সাহিত্যের উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই সঙ্গীত-সংগ্রহের প্রকাশক বঙ্গসাহিত্যানুরাগী

সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।
Universal Love প্রভৃতি বড় বড় কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়ই ভাল শুনায়, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌঁছায় না কেন ? --
আয় রে আয়, জগাই মাধাই আয় !
হরিসঙ্কীর্ত্তনে নাচিবি যদি আয়।
ওরে মার খেয়েচি, নাহয় আরো খাব --
ওরে তবু হরির নামটি দিব আয় !
ওরে মেরেছে কলসীর কানা,
তাই বলে কি প্রেম দিব না -- আয় !
বাউল বলিতেছে --
সে প্রেম করতে গেলে মরতে হয়।
আত্মসুখীর মিছে সে প্রেমের আশয়।
গোড়াতেই মরা চাই। আত্মহত্যা না করিলে প্রেম করা হয় না। (পূর্ব্বেই আর একটি গানে বলা হইয়াছে --
যার আমি মরেছে, তার সাধন হয়েছে।
কোটি জন্মের পুণ্যের ফল তার উদয় হয়েছে।)
তার পরে বলিতেছে --
যে প্রাণ ক'রে পণ পরে প্রেমরতন
তার থাকে না যমের ভয় ;
যে মরে তার আর মরণের ভয় থাকে না। জগৎকে সে ভালবাসে, এই জন্য সে জগৎ হইয়া যায়, সে একটি অতি ক্ষুদ্র " আমি " মাত্র নহে, যে, যমের ভয় করিবে -- সে সমস্ত বিশ্বচরাচর।
অপ্রেমিক বলিবে, এ প্রেমে লাভ কি ? ফুলকে জিজ্ঞাসা কর না কেন, গন্ধ দান করিয়া তোমার লাভ কি ? সে বলিবে, গন্ধ না দিয়া আমার থাকিবার যো নাই, তাহাই আমার ধর্ম্ম ! এই জন্য গন্ধ না দিতে পারিলে জীবন বৃথা মনে হয়। তেমনি প্রেমিক বলিবে মরণই আমার ধর্ম্ম, না মরিয়া আমার সুখ নাই।
লোভী লোভে গণিবে প্রমাদ,
একের জন্য কি হয় আরের মরিতে সাধ।
বাউল উত্তর করিল --
যার যে ধর্ম্ম সেই পাবে সেই কর্ম্ম।
প্রেমের মর্ম্ম কি অপ্রেমিকে পায় ?
বাউল বলিতেছে, সমস্ত জগতের গান শুনিবার এক যন্ত্র আছে --
ভাবের আজগবি কল গৌরচাঁদের ঘরে
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর, আন্‌ছে একতারে
গো সখি, প্রেম-তারে।
প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িৎ খেলাইতে থাকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর নিমিষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে তুমি ভালবাস তাহার কাছে বসিয়া থাক, অদৃশ্য প্রেমের তার দিয়া তাহার প্রাণ হইতে তোমার প্রাণে বিদ্যুৎ বহিতে থাকে, নিমেষে নিমেষে তাহার প্রাণের খবর তোমার প্রাণে আসিয়া পৌঁছায়। তেমনি যদি জগতের প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ প্রেমের তারে বাঁধা থাকে তাহা হইলে জগতের ঘরের কথা সমস্তই তুমি শুনিতে পাও। প্রেমের মহিমা এমন করিয়া আর কে গাহিয়াছে।
জগতের প্রেমে আমরা কেন মজিতে চাহি না ? আমরা আপনাকে বজায় রাখিতে চাই বলিয়া। আমরা

চাই আমি বলিয়া এক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব, তাহাকে কোনমতে হাতছাড়া করিব না। জগৎকে বেষ্টন করিয়া চারি দিকে প্রেমের জাল পাতা রহিয়াছে। অহর্নিশি জগতের চেষ্টা তোমাকে তাহার সহিত এক করিয়া লইতে। জগতের ইচ্ছা নহে যে, তাহার কোন একটা অংশ, কোন একটা ঢেউ, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া জগতের স্রোতকে হুট্ করিয়া দিয়া উজানে বহিয়া যায়। সে চায় সকল ঢেউগুলি একস্রোতে বহে, এক গান গায়, তাহা হইলেই সমস্ত জগতের একটি সামঞ্জস্য থাকে -- জগতের মহাগীতের মধ্যে কোনখানে বেসুরা লাগে না। এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি জগতের প্রতিকূলে "আমি আমি" করিয়া খাড়া থাকিতে চায় সে ব্যক্তি বেশী দিন টিঁকিতে পারে না। ক্ষুদ্র নিজের মধ্যে নিজের অভাব পূর্ণ হয় না। অবশেষে সে দুঃখে শোকে তাপে জর্জ্জর হইয়া জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হাঁপ ছাড়ে। এক গণ্ডূষ জলের মধ্যে মাছ ততক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে ? কিছু দিনের মধ্যেই তাহার খোরাক ফুরাইয়া যায়, জল দূষিত হইয়া পড়ে, সমুদ্রের জন্য তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করে। তখন সমুদ্রে যদি না যাইতে পারে, বড় মাছ হইলে শীঘ্র মরে, ছোট মাছ হইলে কিছু দিন মাত্র টিঁকিয়া থাকে। তেমনি যাহাদের বড় প্রাণ তাহারা বেশি দিন নিজের মধ্যে বন্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। চৈতন্যদেব ইহার প্রমাণ। যাহাদের ছোট প্রাণ তাহারা অনেক দিন নিজেকে লইয়া টিঁকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া চিরকাল পারিবে না, অনন্তকালের খোরাক আমার মধ্যে নাই। দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়ে। এত কথা যে বলিলাম তাহা নিম্নলিখিত গানটির মধ্যে আছে। --

ওরে মন পাখী, চাতুরী করবে বলো কত আর !
বিধাতার প্রেমের জালে পড়বে না কি একবার !
সাবধানে ঘুরে ফিরে থাক বাহিরে বাহিরে,
জাল কেটে পালাও উড়ে ফাঁকি দিয়ে বার বার !
তোমায় একদিন ফাঁদে পড়তে হবে, সব চালাকি ঘুচে যাবে --
অন্ন জল বিনে যখন করবে দুঃখে হাহাকার !

গ্রন্থে প্রেমের গান এত আছে, এবং এক একটি গান শুনিয়া এত কথা মনে পড়ে, যে, সকল গান তুলিলে, সকল কথা বলিলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।

প্রকাশকের সহিত এক বিষয়ে কেবল আমাদের ঝগড়া আছে। তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত ও আধুনিক ইংরাজিওয়ালাদিগের রচনাকে ইহার মধ্যে স্থান দিলেন কেন ? আমরা ত ভাল গান শুনিবার জন্য এ বই কিনিতে চাই না। অশিক্ষিত অকৃত্রিম হৃদয়ের সরল গান শুনিতে চাই। প্রকাশক স্থানে স্থানে তাহার বড়ই ব্যাঘাত করিয়াছেন।

আমরা কেন যে প্রাচীন ও ইংরাজিতে অশিক্ষিত লোকের রচিত সঙ্গীত বিশেষ করিয়া দেখিতে চাই তাহার কারণ আছে। আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের অবস্থা পরস্পরের সহিত প্রায় সমান। আমরা সকলেই একত্রে শিক্ষালাভ করি, আমাদের সকলের হৃদয় প্রায় এক ছাঁচে ঢালাই করা। এই নিমিত্ত আধুনিক হৃদয়ের নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি পাইলে আমরা তেমন চমৎকৃত হই না। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের একটা মিল খুঁজিয়া পাই, তবে আমাদের কি বিস্ময়, কি আনন্দ ! আনন্দ কেন হয় ? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি দেখিতে পাই বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই মগ্নতরী হতভাগ্যের ন্যায় আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগবিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা-নামক ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে না, অসীম মানবহৃদয়ের মধ্যে ইহার নীড় প্রতিষ্ঠিত। ইহা দেখিলে আমাদের হৃদয়ের উপরে আমাদের বিশ্বাস জন্মে। আমরা তখন যুগের সহিত যুগান্তরের গ্রন্থনসূত্র দেখিতে পাই। আমার এই হৃদয়ের পানীয় -- এ কি আমার নিজেরই হৃদয়স্থিত সঙ্কীর্ণ কূপের পঙ্ক হইতে উত্থিত, না, অভ্রভেদী মানবহৃদয়ের গঙ্গোত্রী শিখরনিঃসৃত, সুদীর্ঘ অতীত কালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, বিশ্বসাধারণের সেবনীয় স্রোতস্বিনীর জল ! যদি কোন সুযোগে জানিতে পারি শেষোক্তটিই সত্য, তবে হৃদয় কি প্রসন্ন হয় ! প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদিগের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে

আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে। অতীতকালের প্রবাহধারা যে হৃদয়ে আসিয়া শুকাইয়া যায় সে হৃদয় কি মরুভূমি !

ঐ বুঝি এসেছি বৃন্দাবন।

আমায় বলে দে রে নিতাইধন !

ওরে, বৃন্দাবনের পশুপাখীর রব শুনি না কি কারণ !

ওরে, বংশীবট অক্ষয়বট কোথা রে তমালবন !

ওরে, বৃন্দাবনের তরুলতা শুকায়েছে কি কারণ !

ওরে, শ্যামকূণ্ড রাধাকুণ্ড কোথা গিরি গোবর্দ্ধন !

কেন এ বিলাপ ! এ বৃন্দাবনের মধ্যে সে বৃন্দাবন নাই বলিয়া। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের একেবারে বিচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া ! তা যদি না হইত, যদি আজ সেই কুঞ্জের একটি লতাও দৈবাৎ চোখে পড়িত, তবে সেই ক্ষীণ লতাপাশের দ্বারা পুরাতন বৃন্দাবনের কত মাধুরী বাঁধা দেখিতাম।